দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 5 1999

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ঘটছে

নির্মল সেন

কী ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক'দিন ঢাকার বাইরে ছিলাম। কাগজে দেখলাম তুলকালাম কাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি নিয়ে নিদারুণ হৈচৈ। সকলের অভিযোগের আঙ্গুল শিক্ষকদের দিকে। ঢাকার বাইরে যাবার আগে ভিন্ন খবর পড়েছি ঢাকার দৈনিকগুলোর সাপ্তাহিক রংবেরঙের ক্রোড়পত্রে। সে ক্রোড়পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়, বকুলতলায় ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসাবাসির ছবি দেখেছি। পত্রিকায় পড়েছি ব্যান্ড শো নামক উন্মাদ নৃত্যে শরিক হতে গিয়ে দু' তরুণের মৃত্যুর খবর। তবে দু'জনেই ছাত্র। তারপর একত্রিশ ডিসেম্বর নয়, থার্টি ফার্স্ট রজনি। না বলা ভাল। বেশ কিছুদিন আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাহিনী শুনেছি। অধিক রাত পর্যন্ত ছেলেদের মতো হলের বাইরে থাকা তাদের মৌলিক অধীকারের অঙ্গ। এ দাবি আমিও সমর্থন করেছি।

তারপর পড়েছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের খবর। এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন। ধর্মঘট অবরোধ। শুনেছি শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে একটি সমঝোতা হয়েছে। শুনেছি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগর থেকে অনেক দূরে আশুলিয়া লেকের কাছে। সন্ধ্যার পরে।

মনে হয়েছে ছাত্রীদের অনেক রাত পর্যন্ত হলের বাইরে থাকার দাবিটি মৌলিক হলেও সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সর্বত্রই স্থান কাল পাত্র বলে কতগুলো প্রশ্ন আছে। এ ছাড়া কতগুলো ঘটনা আমাদের দেশে সম্প্রতিকালে ঘটেছে। এক খ্যাতনামা শিল্পপতির কন্যা ধর্ষিত এবং নিহত হয়েছে নিজ ভবনে। যখন পিতা-মাতা ঐ ভবনেই ছিলেন। আর এক শিল্পপতির পুত্র বন্ধু-বান্ধীদের নিয়ে সারা রাত গুলশানে পানাহার করে ভোর রাত থেকে হারিয়ে গেছে। এ নিয়ে নানান কাহিনী আছে। পিতা ছুটেছেন ইন্টারপোল পর্যন্ত। কিন্তু সন্তান ফিরেনি। আজকের সমাজে বাঁচতে গেলে এ ঘটনাগুলো মনে রাখতে হয়।

আমি চমৎকৃত হয়েছি শুনে যে, যৌন হয়রানি নিয়েও নাকি দলীয়করণ আছে। ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার কাকতালীয় হলেও সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের দিন থেকে। আমি এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই না।

শুনেছি সচেতন ছাত্র সমাজ নামে একশ্রেণীর ছাত্র নাকি গার্মেন্টিসের মেয়েদের কুশপুত্তলিকায় থু-থু দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। আমার মনে হয় ওরা বুঝতে পারেনি যে, তাদের উচিত ছিল থু থু আকাশের গায়ে ছুড়ে দেয়া। আর এই সচেতন ছাত্ররা যদি গ্রাম থেকে এসে থাকে তাদের সবিনয়ে বলব, ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবেন, নিজেদের স্বজন এবং পড়শীদের মুখের দিকে তাকাবেন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তারা স্বজনদের মুখের আদলের সাথে গার্মেন্টিসের মেয়েদের মুখের আদলের মিল পাবেন। কারণ তারা কিংবা তাদের স্বজনরা ৫৪ হাজার বর্গমাইলের সীমানার বাইরে বসবাস করে না।

তবে আমি বুঝতে অক্ষম যে পোশাক শিল্পের মেয়েদের বিষয়টি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো। কে বা কারা তাদের যৌন হয়রানির বিতর্কে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে হাজির করলেন। এই মেয়েদের হেনস্তা করার জন্য তারাও কম দায়ী নয়।

তবে আমার মূল প্রশ্ন ভিন্নতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পটভূমিতে আমার কি বুঝতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি এ মুহূর্তে শিক্ষাঙ্গনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। পত্রিকায় পড়েছি সন্ত্রাস, ভর্তি সমস্যা বেতনের সমস্যা এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় বর্ধিত ফী নেবার সমস্যার কথা। শুনেছি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য বছরের প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। আমাদের ছাত্র আন্দোলনের জীবনে এগুলোই ছিল কিন্তু আন্দোলনের মুখ্য বস্তু। এ সমস্যা আজকে আরও তীব্র হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাপটে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। লাখ লাখ টাকা দিয়ে ভর্তি কেনা হচ্ছে। ডিগ্রী কেনা হচ্ছে। মেধা নয়, বাপের টাকাই এখন প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ামক শক্তি। এ শক্তিকে উপেক্ষা করে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে কি। অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে হঠাৎ করে সমস্ত আন্দোলন যেন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে।

আর যদি যৌন হয়রানির কথা বলেন তা হলেও ব্যাখ্যা করতে হবে যৌন হয়রানির সাথে ভাল বাসাবাসির সম্পর্ক। এবার ভাল বাসাবাসির কথা দিয়েই শুরু করি। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে দু'জন খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। দু'জনই অর্থনীতির শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোকালে উভয়ই একজন ছাত্রীর প্রেমে পড়েছিলেন। উভয়েই পাণি প্রার্থী। মেয়েটি শর্ত দিয়েছিল পরীক্ষায় যে ভাল করবে তাকেই সে বিয়ে করবে। ঘটনা তেমনই ঘটেছিল। ঐ কলেজে আর এক অধ্যাপক আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। মেয়েদের কথা উঠলেই তিনি হাসতেন, বলতেন, কোন মেয়েকেই বিশ্বাস কর না।

তার ঘটনার একটি ভিন্ন রূপ আছে। তখন অশ্বিনীকুমার দত্তের আমল। অনেক তদ্বির করে ব্রজমোহন কলেজে সহশিক্ষা চালু করা হয়েছে। আমার ঐ ইংরেজীর শিক্ষক এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ছাত্রী রাজি হলো। কিন্তু অশ্বিনী কুমার দত্ত রাজি হলেন না। তিনি বললেন, কেবল মাত্র সহশিক্ষা চালু হয়েছে। এ মুহূর্তে শিক্ষক-ছাত্রী বিয়ে হলে অভিভাবকরা কলেজে ছাত্রী পাঠাবেন না। আমার প্রিয় ইংরেজী শিক্ষক তার কথা মানলেন না। তিনি দরখাস্ত করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রয়াত আশুতোষ মুখপাধ্যায়ের কাছে। উপাচার্য লিখে পাঠালেন এ ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই। কিছু দিন পর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। আর সেই ইংরেজী শিক্ষক আজীবন অকৃতদার থেকে গেল।

এখানে যৌন হয়রানির বিষয়টি একেবারে সূক্ষ্ম। কিন্তু এ নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে সমাজে। আদিকাল থেকে এ ধরনের আচরণের একটি বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তাঁর বিখ্যাত পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র নামক পুস্তকে। তিনি লিখেছেন বিয়ের বাইরে এ ধরনের সকল আচরণই ব্যভিচার। এ ব্যাখ্যা খুব অসত্য কি। যাকে বিয়ে করার নিশ্চয়তা নেই, তার সাথে বসবেন, হাঁটবেন, হাত ধরবেন, তাকে বিয়ে করতে না পারলে আত্মহত্যা করবেন এমন কথা বলে আবার অন্যের পিছু ছুটলে সেটাওকি ব্যভিচার হবে না, সেটা কি এক ধরনের হয়রানি নয়। আমার মনে হয় এ ধরনের আন্দোলনের আগে এ মানসিকতা আচরণও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেয়া দরকার। স্থির হওয়া উচিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি বলেন, তাহলে অনেক কথাই এখানে লিখতে পারব না। কারণ আমরা অনেকে এখনও জীবিত। তবে নির্দ্বিধায় একজন বিভাগীয় প্রধানের কথা উল্লেখ করতে পারি। শুনেছি তিনি নাকি শর্ত দিতেন-যে ছাত্র আর কন্যাকে বিয়ে করবে সেই তার বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবে। যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁরা বলুন এটা কোন ধরনের হয়রানি। এটা কি যৌন হয়রানি। নাকি নিয়ামকের আসনে বসে ঘটনা নিয়ন্ত্রণের মানসিকতা। এ মানসিকতা আদৌ সমাজ নিরপেক্ষ কি। এবং সেই সমাজ টাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আন্দোলনের সামর্থকতা বুঝতে আমি অক্ষম।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, তবুত কিছু করলাম। সব চাইতে পবিত্র অঙ্গন বলে কথিত অঙ্গন যে পবিত্র নয় সে চিত্র মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। আমি বলব তথাস্তু। এবং প্রস্তাব করব তাহলে আমার সাথে আসুন। চলুন সন্ধ্যার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুবের এলাকায় একটু ঘুরে আসি। চলুন সন্ধ্যার পর সমাজের একটা চিত্র দেখি। নিশ্চয়ই এতদিনে লক্ষ্য করেছেন রমনার সড়কের পাশে সন্ধ্যার পর ছাই ভস্ম মেখে অনেক তরুণী দাঁড়িয়ে থাকে। সাজ-সন্ধ্যার সুযোগ পেলে হয়ত তাদের আমার কিংবা আপনার বোন কিংবা মাসির মতো দেখাত। ওদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। ওরা এখন দেহ বিক্রি করে, ওদের এখন প্রতিদিনের বাঁচার প্রশ্ন মুখ্য। বলুন তাদের নিয়ে কি করবেন। আমি রাস্তায় হাঁটি। সচিবালয়ের দেয়ালের পাশে কিছু তরুণ-তরুণীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখি। ওখানে ওরা রান্না-বান্না করে। ওদের দিনযাপন ঐ ফুটপাথে। সন্ধ্যা বেলা ওরা উধাও।

দূরে আরও পুবে এগোলে দৈনিক বাংলার পশ্চিমে বাঁ দিকে একটি ছোট গলি আছে। বেশ কয়েক সন্ধ্যায় এক রমণীকে ঐ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি একটি বাচ্চা কোলে করে। তখন কান্দুপট্টি থেকে মহা উল্লাসে বারবণিতাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এক সাংবাদিক বন্ধুকে দিয়ে ঐ মহিলার খবর নিতে চেষ্টা করেছি। শুনেছি কান্দুপট্টিতে ঐ মহিলার বাচ্চা হয়েছিল। কান্দুপট্টিতে বাচ্চা রাখার জায়গা ছিল না। এখন আশ্রয় নেই। বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে হয়। খদ্দের জুটে না। আমরা সচেতন মানুষরা কান্দুপট্টি নিয়ে রাস্তায় নামিনি। কোন কোন বেসরকারী সংস্থা কিছুদিন ওদের নিয়ে আন্দোলন করে ছবি ছাপিয়েছে। তারপর সবশেষ।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। জেনারেল এরশাদের আমল। নৌ-বাহিনীর প্রধান সিরাজগঞ্জে গেলেন। তিনি রেলমন্ত্রী। রেলের জমিতে বারবনিতাদের ঘরবাড়ি। সদাসয় মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওদের উচ্ছেদ কর। উৎসাহী সমর্থকরা এক ঘন্টার মধ্যে ওদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিল। নিরাশ্রয় হলো অসংখ্য বারবনিতা। ওদের জন্য দিনের পর দিন লিখেছিলাম। ওদের চিঠি আছে আমার ড্রয়ারে। ওদের বলেছিলাম একটা জরিপ কর। ওরা চিঠি লিখেছিল। আমাকে জানিয়েছিল ওদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন ঘরে ফিরতে চায় না। ওরা এই ব্যবসায় থাকতে চায়। ওদের বিশ্বাস এ সমাজ ওদের গ্রহণ করবে না। ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। অথচ এই সমাজ পাল্টাবার ক্ষমতা ওদের নেই।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কি কোন আন্দোলন হবে না? কেউ কথা বলবে না? নিশ্চয়ই আন্দোলন হবে। কথা বলবে। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রতিরোধ। সে ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তি হিসাবে নিগৃহীতের মর্যাদাবোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিরোধ শক্তি জোগাতে পারে সমাজ বদল মুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলব–আমরা কি হঠাৎ করে খুব বেশি এগিয়ে গেছি না। সমাজটা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়। মূল শত্রুকে চিহ্নিত না করে আগাছায় হাত দিয়ে লাভ আছে কি। ইতোমধ্যে লক্ষ্য করছি, কেউ কেউ অনেক পরিশ্রম করে যৌন হয়রানি সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন। আপনারা কি ভেবে দেখেছেন যে, এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করতে গেলে ভালবাসা, ব্যভিচার, পরকীয়া প্রেম সব কিছুরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। ভেবে দেখেছেন কি আদালতে এ ব্যাখ্যার ছওয়াল জবাব কেমন হবে। আর সমাজ পাল্টাবার আন্দোলন না করে এ ধরনের আগাছার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে আমাদের মতো রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি উঠবে নাকি মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় চাই–অনেক হয়েছে আর নয়। এবার থেকে মেয়েরা মেয়েদের পড়াবে। সহশিক্ষা চাই না। ভুলে গেলে চলবে না এ দাবি একটি মহল থেকে এখনও আছে।

তাহলে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কি কোন আন্দোলন হবে না? কেউ কথা বলবে না? নিশ্চয়ই আন্দোলন হবে। কথা বলবে। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রতিরোধ। সে ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তি হিসাবে নিগৃহীতের মর্যাদাবোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিরোধ শক্তি জোগাতে পারে সমাজ বদল মুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যে সমাজে মন্ত্রীদের স্ত্রীর সুপারিশে কাজ হয়, পারমিট লাইসেন্সের জন্য সুন্দরী একান্ত সচিব রাখতে হয় সে সমাজটাকে আড়াল করে আন্দোলন গড়ে তুলে বেশ দূর পৌঁছান যাবে কি।